####  ‘ডিজিটাল গেমিং’ রোগ : কোন্ অতলে হারিয়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম!

মাঠে গিয়ে ধুলো কাদা মেখে, ঘেমে নেয়ে, রোজ বিকেলে খেলা শেষে বাড়ি ফেরা- এ দৃশ্য আজকাল যেন হারিয়ে যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় খেলার জায়গার অভাব, পড়ার চাপ, যেমন তেমন ছেলে-পিলেদের সাথে মিশে খারাপ হবার ভয়- কত না অভিযোগ অভিভাবকদের! তার পরিবর্তে আমাদের অভিভাবকরা বিনোদনের নামে যা তুলে দিচ্ছেন ছেলে-মেয়েদের হাতে, তার ক্ষতির পরিমাণটা তাদের ধারণারও বাইরে।

পশ্চিমা বিশ্বের মতো আমাদের অনেক পরিবারে বাবা-মা দুজনই কর্মব্যস্ত। উভয়েই ছুটছেন ‘ক্যারিয়ার ও সফলতা’ নামক সোনার হরিণের পিছনে। এদিকে সন্তান বড় হচ্ছে কাজের বুয়ার কাছে। অনেক অপরিণামদর্শী মায়েরাই শিশুকে খাবার খাওয়াতে, তার কান্না থামাতে- টিভি, কম্পিউটার ও ভিডিও গেমসের অভ্যাস করাচ্ছেন।

অন্যদিকে শহরের ইট, পাথর আর কংক্রিটের আড়ালে আটকা পড়ছে শিশুদের বর্ণিল শৈশব। গ্রামের শিশুরা খেলাধুলার কিছুটা সুযোগ পেলেও শহরের শিশুদের সে সুযোগ কম। বড়দের মতো শিশুদের মধ্যেও ভর করছে শহুরে যান্ত্রিকতা। ফলে তারা খেলাধুলার আনন্দ খুঁজে ফিরছে মাউসের বাটন টিপে, কম্পিউটারের পর্দায় গেমস খেলে। অনেক সময় তাদের এ আকর্ষণটা চলে যাচ্ছে আসক্তির পর্যায়ে। ধীরে ধীরে তারা নির্র্ভরশীল হয়ে পড়ছে কম্পিউটার-মোবাইল-ট্যাব গেমসের উপর। এজন্য প্রথমেই বলা যায়, ভিডিও গেমস আমাদের শিশু-কিশোরদের প্রকৃত শৈশব-কৈশোর কেড়ে নিচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল, অল্পবয়সী অর্থাৎ ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যেই ইন্টারনেটে ডুবে থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাজ্যে এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৩-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শিশু সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করে ভিডিও গেমস, কম্পিউটার, ই-রিডার্স, মোবাইল ফোন ও অন্যান্য স্ক্রিনভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পিছনে। বাংলাদেশের শিশু কিশোরদের মধ্যেও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে একটি গবেষণা সংস্থার প্রতিবেদনে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেসবুক ব্যবহারকারী হিসেবে ঢাকা শহরের নাম উঠে এসেছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, আট বছরের শিশুরাও ব্যবহার করছে ফেসবুক।

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বিনোদনের ভয়াবহ পরিণতির চিত্র পাওয়া গেছে ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’-এর এক জরিপে। এতে দেখা যায়, ঢাকায় স্কুলগামী শিশুদের প্রায় ৭৭ ভাগ পর্নোগ্রাফি দেখে। প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আলমামুন বলেন, ৮ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ঢাকার ৫০০ (পাঁচ শ) স্কুলগামী শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, ছেলে শিশুরা সবসময় যৌন মনোভাবসম্পন্ন থাকে, যা শিশুর মানসিক বিকৃতির পাশাপাশি বাড়িয়ে দিচ্ছে মারাত্মক যৌন সহিংসতার ঝুঁকি। শিশু কিশোরদের এ অবস্থা এখন বিশ্বব্যাপী মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। [সূত্র : দৈনিক সংগ্রাম (অনলাইন) ২৩-৩-২০১৭ ঈ.]

উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী ভিডিও গেমসের আবিষ্কার হয় ১৯৪০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর সত্তর-আশির দশকের মধ্যে এটি জনপ্রিয়তায় পোঁছে। সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে নির্মিত আর্কেড টাইপের ভিডিও গেম-এর নাম ছিল কম্পিউটার স্পেস। এরপর আটারি কোম্পানি বাজারে আনে বিখ্যাত গেম পং। তারপর ধীরে ধীরে আটারি, কোলেকো, নিনটেনডো, সেগা ও সনির মতো ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো নানা উদ্ভাবন ও প্রচারণা চালিয়ে কয়েক দশকের মধ্যে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে মানুষের ঘরে পোঁছে দেয় পুঁজিবাদী সভ্যতার এ বিনোদনপণ্য।

২০০০ সনে সনি কোম্পানি জরিপ করে দেখেছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি চারটি বাড়ির একটিতে একটি করে সনি প্লে স্টেশন আছে। ২০০৯ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শতকরা ৬৮ ভাগ আমেরিকানের বাড়ির সব সদস্যই ভিডিও গেম খেলে।

তারপর সময় বদলেছে। কম্পিউটার এবং ভিডিও গেমস ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম লাভজনক ও দ্রুত বর্ধনশীল শিল্প ইন্ড্রাস্ট্রি। বিশ্বজুড়ে আজ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও গেম এবং গেমাররা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে প্রায় ২২০ কোটি মানুষ নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ভিডিও গেম খেলে থাকে। যাদের অধিকাংশই হচ্ছে অল্প বয়সী শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণী। এদের বদৌলতে গ্লোবাল ভিডিও গেম বাজারের আর্থিক মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৮.৯০ মিলিয়ন ডলার! এর মধ্যে ‘মোবাইল গেমিং’ই হচ্ছে সবচে বেশি পয়সা আয় করা সেক্টর। স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটে গেমিং প্রতি বছর ১৯শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। (সূত্র : উইকিপিডিয়া; মাসিক সি নিউজ- www.cnewsvoice.com; bengalinews..)

কী থাকে এসব ভিডিও গেমসে?

প্রশ্ন হচ্ছে, কী থাকে এসব ভিডিও গেমসে? কেন তাতে এত আসক্তি? খোঁজ করলে জানা যায়, জনপ্রিয় গেমগুলোর মধ্যে কিছু আছে ক্রিকেট ফুটবলের মতো। নানা রকম দল তৈরি করে এসব খেলা খেলতে হয়। খেলায় হারজিত হয়। এক ম্যাচ খেললে আরেক ম্যাচ খেলতে ইচ্ছে করে। এর কোনও শেষ নেই। ছেলে মেয়েদেরকে কম্পিউটারের সামনে থেকে টেনে তোলা যায় না। এতে চট করে এক ঘেয়েমিও আসে না। পড়াশুনা শিকেয় তুলে ছেলে মেয়েরা একটার পর একটা ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ খেলে যায়। অনলাইনভিত্তিক দাবা এবং তাসও এসবের অন্তর্ভুক্ত। এসব আবার সাধারণত খেলে অবসর বুড়ো খোকারা।

বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়-

এক ধরনের গেম আছে, তাতে প্রচন্ড গতিসম্পন্ন গাড়ি নিয়ে রাস্তা, মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ছুটে চলতে হয়। বিপজ্জনক ব্যাপার হল, এই ছুটে চলার পথে অন্য প্রতিযোগীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়া, গাড়ির নিচে মানুষ পিষে ফেলা, পথচারীর কাছ থেকে মোটর সাইকেল বা গাড়ি কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে ফুটপাতে উঠে পড়া, রাস্তার স্থাপনা ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা, পুলিশ ধাওয়া করলে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা- এসব নাকি গেমের সবচে আকর্ষণীয় বিষয়! এ অনৈতিক কাজগুলো করে যে যত পয়েন্ট অর্জন করতে পারে সেই বিজয়ী হয়!

আর এক ধরনের গেম আছে, যার পুরোটা জুড়েই থাকে হিংস্রতা, মারামারি, যুদ্ধ, দখল এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যত বেশি সহিংসতা তত বেশি পয়েন্ট! হিংসার উদ্দাম আনন্দ নিয়ে দুর্গম গিরিপর্বত, নদীনালা, জঙ্গল ও সমুদ্রের উপর দিয়ে শত্রু খুঁজে বেড়ানো। বাংকার খনন করে ওঁত পেতে থাকা। প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণের টেনশন। আরো দ্রুত চলতে হবে! যত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সম্ভব প্রতিপক্ষকে শেষ করতে হবে!

কোমলমতি শিশু কিশোররা নিজেরাও জানে না, কেন তারা এ মারণখেলা খেলছে! একের পর এক মানুষ খতম করছে। কখনো হাতুড়িপেটা করে মাথা থেতলে দিচ্ছে। মুহূর্তে রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। কখনো গ্রেনেড ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের পা জখম করছে। এরপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পলায়নপর মানুষটির উপর মারছে দ্বিতীয় গ্রেনেড। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে তার হাত পা। তারপর রক্তমাখা দেহটা লুটিয়ে পড়ছে খেলোয়াড়ের পায়ের উপর!

চোখের সামনে ভাসছে জীবন্ত যুদ্ধক্ষেত্র। কানে আসছে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের বাস্তব আওয়াজ। এমনকি আহত শত্রুসেনার রক্তমুখের গর্গর শব্দটাও শুনতে পাচ্ছে আপনার সন্তান! এতে কিন্তু তার আনন্দ, উৎসাহ এবং উত্তেজনা কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কোনো কোনো খেলায় রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের পকেট এবং ব্যাগ থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করতে পারলে পাওয়া যাচ্ছে বাড়তি পয়েন্ট! এমনকি রাস্তায় ড্রাগ বিক্রেতার কাছ থেকে ড্রাগও কেনা যাচ্ছে!

এখানে একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। এই গেমগুলিই এখন সবচে জনপ্রিয়। এসব ধ্বংসাত্মক গেমসের মধ্যে এ যাবতকালের পৃথিবীর সবচে জনপ্রিয় গেমটির নাম ‘পাবজি’ (চটইএ)। দক্ষিণ কোরিয়ার ভিডিও গেম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান পিইউবিজি কর্পোরেশন ২০১৭-এর মার্চে এ অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার গেমটি বাজারে আনে।

এর নির্মাতা ব্লু হোয়েল কোম্পানি আর পরিচালক আইরিশ ওয়েব ডিজাইনার ব্রান্ডন গ্রিন। রিলিজের মাত্র তিন দিনের মাথায় ‘প্লেয়ার আননউনস ব্যাটেলগ্রাউন্ডস’ সংক্ষেপে ‘পাবজি’ নামক এ গেম প্রায় ১১ মিলিয়ন ডলার আয় করে। আপনি জানলে অবাক হবেন, পাবজি গেম নির্মাণকারী সংস্থা প্রতিদিন ৬,৮৯০০০ ডলার আয় করে থাকে গেমারদের থেকে। প্রথম ৬মাসেই তারা লাভ করেছে ৩৯০ মিলিয়ন ডলার।

রিপোর্ট অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে এখন প্রতি মাসে প্রায় ২২৭ মিলিয়ন মানুষ এ গেম খেলে। আর প্রতিদিন খেলে প্রায় ৮৭ মিলিয়ন লোক। লাখো গরিবের দেশ বাংলাদেশেও প্রতিদিন এ গেম খেলছেন ১ কোটি ৪০ লাখ মানুষ! [সূত্র: ধষশন সবফরধ ১৯-১-১৯ঈ.; বাংলাদেশ প্রতিদিন (অনলাইন) ১৫-৩-২০১৯ঈ.; প্রবাস সংবাদ নিউজ পেইজ ২০-৩-১৯ঈ.)

অনলাইনভিত্তিক এই ভিডিও গেমটিতে একসাথে ১০০জন মানুষ একটি পরিত্যাক্ত দ্বীপে থাকে। খেলোয়াড়কে প্রথমে প্যারাসুটের মাধ্যমে সেখানে নামিয়ে দেয়া হয়। সেখানে একে অপরকে হত্যা করে টিকে থাকতে হয়। ভয়ংকর সব গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে খতম করতে হয় একে একে সবাইকে। এক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতারও আশ্রয় নেয়া হয়। চলে হত্যার ষড়যন্ত্র-পরিকল্পনা। অনলাইনে বন্ধুরা পরস্পরে কথাবার্তা বলে এ হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে শলা-পরামর্শ করে। কয় পয়েন্ট পাওয়া গেল, কতজন নিহত হল, বাকিদেরকে কীভাবে হত্যা করা যায়- এসবই এ ভয়ংকর গেমের বিষয়। হত্যাযজ্ঞ শেষে যে ব্যক্তি বা যে গ্রুপ বেঁচে থাকে, তারাই হয় বিজয়ী।

সব মিলিয়ে মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় কিশোর-তরুণেরা ‘পাবজি’তে এতটাই মগ্ন থাকছে যে, বাস্তব পৃথিবী ভুলে তারা এক বিপজ্জনক নেশায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ভিডিও গেমসের এ নিধনযজ্ঞ অনেক বাস্তব অনুভব হচ্ছে তাদের কাছে।

আমরা যদি এখন ও সচেতন না হয়ে এই সমস্ত গেমস থেকে বাচ্চাদের বিরত রাখতে না পারি তা হলে আমাদের জন্য এক ভয়ানক পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে। কারন আজকের এই কিশোররাই আগামীর ভবিষ্যত নির্ধারন করবে।